আনন্দবাজার পত্রিকা

সম্পূর্ণ সাধারণ শব্দেরও ‘বিপাস্ত’ করা চলেছে

তবে তো হাতে রইল কেবল অমর চিত্রকথা

মৈত্রীশ ঘটক

১৬ জুলাই, ২০১৭

গরু, গুজরাত, হিন্দু ও হিন্দুত্ব— এই চারটি শব্দ অমর্ত্য সেনের মুখে থাকার জন্য সুমন ঘোষের তথ্যচিত্র দি আর্গুমেন্টেটিভ ইন্ডিয়ান’কে ছাড়পত্র দিল না ভারতীয় সেন্সর বোর্ড। অনীক দত্তের আসন্ন মুক্তিপ্রার্থী কাহিনিচিত্র মেঘনাদবধ রহস্য-র কিছু সংলাপে ব্যবহৃত শব্দ নিয়েও আপত্তি উঠেছে। সংবাদমাধ্যম সূত্রে জানা যাচ্ছে, সেগুলো ‘বিপ’ না করলে ছাড়পত্র পাবে না সেই ছবিও। কী সেই শব্দ? তার একটি উদাহরণ হল, সিনেমার একটি চরিত্র বলছে, মাইকেল মধুসূদন দত্তের মেঘনাদবধ কাব্যে রামকে সর্বগুণোজ্জ্বল এবং রাক্ষসদের সর্বদোষকলঙ্কিত— এ রকম সাদা-কালো ভাবে দেখানো হয়নি, এ কথা না বলতে। নয়তো কে জানে, এ রামরাজ্যে সেই বইও নিষিদ্ধ হয়ে যেতে পারে। আপত্তি ‘রাম’ এবং ‘নিষিদ্ধ (ব্যান)’ শব্দ দুটি নিয়ে। এখন, দার্শনিক ভাবে দেখলেও নিষিদ্ধ শব্দ নিষিদ্ধ করার মধ্যে একটা স্ববিরোধী ব্যাপার আছে— কাউকে চেঁচিয়ে না চেঁচাতে বলার মতো। কিন্তু বিপ নিয়ে বিপদ আরও অনেক বেশি।

যাযাবর বলেছিলেন, আধুনিক বিজ্ঞান মানুষকে দিয়েছে বেগ, কিন্তু কেড়ে নিয়েছে আবেগ। তাঁকে অনুসরণ করে বলা যেতে পারে, বিজেপি সরকার আমাদের দিয়েছে ‘বিপ’, আর কেড়ে নিয়েছে ‘বিফ’। গোমাংস নিষিদ্ধ করার পাশাপাশি চলচ্চিত্রে সম্পূর্ণ সাধারণ শব্দ ‘আপত্তিকর’ বলে তাকে ডুবিয়ে দেওয়া হচ্ছে বিপধ্বনিতে। লিখিত অক্ষরের ওপর যেমন কালো কালি লাগানো হয়, শব্দকে দমিয়ে দেওয়া হচ্ছে বিপের শাসানিতে, শিবরামের ভাষায় বলা যেতে পারে, তার ‘বিপাস্ত’ করা হচ্ছে। নিন্দুকে যতই বলে বাংলার ভাঁড়ারে কিছুই নেই, শূন্য, কেউ অস্বীকার করতে পারবে না যে, বাঙালির আছে দুই মোক্ষম ব-এ শূন্য র: রসবোধ আর রসনা। আরএসএস-এর মনোনীত সংকীর্ণ খাদ্যাভ্যাস এবং সংকীর্ণতর সমাজচেতনা হিন্দু রক্ষণশীল সমাজের বাইরেও সবার ওপরে চাপিয়ে দেওয়ার চেষ্টা নিয়ে সোশ্যাল মিডিয়ায় রসিকতার ফোয়ারা ছুটছে। যেমন, গরু বলা যাবে না, গোস্ত খাওয়া যাবে না, রাম

বলা যাবে না, রাম খাওয়া যাবে না, তা হলে আর ‘অচ্ছে দিন’ তো দূরের কথা, বাজারে গিয়ে বিরস বদনে ‘উচ্ছে দিন’ বলতে হবে।

সেন্সর বোর্ডের এই সব উদ্ভট ক্রিয়াকাণ্ড আমাদের সুকুমার-পরশুরাম-শিবরাম সমৃদ্ধ রসবোধে প্রভূত হাসির খোরাক জোগাতে পারে, কিন্তু যে শব্দগুলো নিয়ে আপত্তি উঠেছে, তার রাজনৈতিক যুক্তি বোঝা শক্ত নয় মোটেই। মোদী সরকার, বিজেপি দল এবং হিন্দুত্ববাদ নিয়ে কোনও সমালোচনা সহ্য করা হবে না, তা নোবেলজয়ী অর্থনীতিবিদ অধ্যাপক সেনের রাজনৈতিক মতামতই হোক, বা প্রখ্যাত পরিচালক অনীক দত্তের চিত্রনাট্যের সুপরিচিত শ্লেষাত্মক সংলাপ।

এখন, তথ্যচিত্রে রাজনৈতিক মতামত প্রকাশ নিয়ে সেন্সর বোর্ডের হস্তক্ষেপ মত প্রকাশের স্বাধীনতায় প্রত্যক্ষ আঘাত। আর, অধ্যাপক সেনের মতকে মোটেই বিতর্কিত বলা যায় না, কারণ বিজেপি ২০১৪ সালে ৩১% ভোট পেয়েছিল এবং যাঁরা বিজেপির সমর্থক নন, তাঁদের একটা বড় অংশের মতামত এর থেকে খুব আলাদা নয়। কিন্তু, কাহিনিচিত্রে এক চরিত্রের মুখে সরকারের হালকা সমালোচনার ওপর বিপাঘাত সূক্ষ্ম হলেও, এক দিক থেকে দেখলে আরও মারাত্মক এক অশনি সংকেত। এই যুক্তিতে অমর চিত্রকথা ঘরানার সাহিত্য বাদ দিলে, মহাভারত থেকে মহেশ, যে কোনও কাহিনি নিয়ে বানানো ছবির যে কোনও সংলাপে বিপক্ষেপ করা যায়। গোমাংস ভক্ষণ, ব্যভিচার, বহুবিবাহ, জাতিভেদ প্রথা (একলব্য এবং জতুগৃহ দহন), বীভৎস রস (কীচক বধ), দেবতাদের নিয়ে কেচ্ছাকাহিনি (যথা, দেবরাজ ইন্দ্রের সিলেবাস-বহির্ভূত কর্মকাণ্ডের আখ্যান)— কী নেই মহাভারতে? আর সেন্সর বোর্ডের যে লিখিত আইন, তাতে জাতীয় স্বার্থ যাতে বিঘ্নিত না হয়, এবং বিভিন্ন গোষ্ঠীর কারও অনুভূতিতে আঘাত না লাগে বা তাদের মধ্যে কোনও রকম অশান্তি না হয়— এই ধরনের ধোঁয়াটে কথা আছে, যার নানা ব্যাখ্যা হয়, এবং সংকীর্ণ ব্যাখ্যায় প্রায় যে কোনও সিনেমার কোনও না কোনও সংলাপে বিপযোগ্য শব্দ বার করা যেতে পারে।

আসলে সংবাদমাধ্যম বা সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে মতপ্রকাশের ওপর যে কোনও রকমের সরকারি নিয়ন্ত্রণেই একটা অভিভাবকসুলভ ব্যাপার আছে। রাষ্ট্র যেন ঠিক করে দেবে নাগরিকেরা পরস্পরের সঙ্গে কী ভাবে ভাবের আদানপ্রদান করবে। এতে দুটো মূল সমস্যা: অকার্যকরতা এবং অবাঞ্ছনীয়তা।

তথ্যপ্রযুক্তির বিপ্লবের এই যুগে, সেন্সর বোর্ড মনোনীত না করলেও যে কোনও ছবি ইন্টারনেটে তুলে দেওয়া যায়। জনসমুদ্রের অগণন তরঙ্গ নিয়ন্ত্রণ করবে কোন মজন্তালি সরকার? যে সময়ে, প্রযুক্তির যে পর্যায়ে সরকার কে কী দেখতে পারবে তা নিয়ে একচেটিয়া কর্তৃত্ব ফলাতে পারত, সে যুগ দীর্ঘ কাল অতিবাহিত। এমনকী চিন সরকারও ইন্টারনেট নিয়ন্ত্রণের হাজার চেষ্টা সত্ত্বেও ব্যর্থতা স্বীকার করে নিয়েছে। তাই সেন্সর বোর্ডের অত্যধিক তৎপরতা অসফল হতে বাধ্য। শুধু তা-ই না, যদি দেশের সম্মানরক্ষা মূল উদ্দেশ্য হয়, তা হলে সারা পৃথিবীর সংবাদমাধ্যমে আমাদের সেন্সর বোর্ডের শিবঠাকুরের আপন দেশে আইন-কানুন সর্বনেশে ধরনের কীর্তিকলাপ প্রচার পেলে, সেই উদ্দেশ্য সাধিত হয় কি?

আর বাঞ্ছনীয়তার কথা ভাবলে, গণতান্ত্রিক সমাজে রাষ্ট্রের হাতে কে কী দেখবে বা শুনবে, তা নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা থাকার যৌক্তিকতা কী? সংস্কৃতির জগতে সেন্সর বোর্ডের মতো অভিভাবকের দরকার কী? আমরা নিজস্ব গণ্ডির মধ্যে যে ভাবে কথা বলি, যে রকম পোশাক পরি, বাইরের জগতে নিশ্চয়ই তা করি না, কিন্তু সেটা আমরা নিজেদের বিবেচনা অনুযায়ী করি। সামাজিক প্রথার যে সীমারেখা, তা অতিক্রম করলে তার ফল আমাদের ভোগ করতে হয়। মত প্রকাশের স্বাধীনতা থাকলেও, কাউকে অপ্রিয় কথা বললে বা তার অনুভূতিতে আঘাত দিলে তার কাছ থেকে যেমন ভবিষ্যতে প্রীতি বা সহযোগিতা আশা করা যায় না, সেই রকম বিতর্কিত সিনেমা বানালে সেই পরিচালকের ভাবমূর্তি এবং ভবিষ্যতে ছবির দর্শক সংখ্যা প্রভাবিত হবে। এই বোধ ও বিবেচনা আমাদের নিজেদেরই থাকা উচিত, রাষ্ট্রের সামাজিক আদানপ্রদানে বা কথোপকথনে বা সাংস্কৃতিক ক্রিয়াকর্মে নাক গলানো উচিত না। আর, কোনও সিনেমা আমাদের আপত্তিকর মনে হলে, আমাদের

হাতে আছে চরম এক অস্ত্র— সেটা না দেখা। ঠিকই, কোন ছবিতে কী আছে, সেটা দেখার আগে জানতে গেলে কিছু তথ্য দরকার। তার জন্য কোন ছবি কোন শ্রেণির দর্শকবৃন্দের জন্যে উপযুক্ত, সে রকম একটা শ্রেণিবিভাগের প্রয়োজন আছে ঠিকই, কিন্তু তার বেশি সরকারি হস্তক্ষেপের দরকার আছে কি? একটা সিনেমা নিয়ে জানার জন্য লোকের মুখের কথা, সমালোচকদের বক্তব্য, এ রকম আরও তো অনেক সূত্র আছে।

রসিকতা, হতাশার সঙ্গে মোকাবিলা করার মোক্ষম টোটকা। আর, বাঙালির রসবোধ সিঞ্চিত হয়েছে হতাশা ও বঞ্চনার দীর্ঘ ইতিহাসের স্রোতে। তাই আপাতত আমরা সেন্সর বোর্ডের তুঘলকি কাজকম্মে খানিক হাসিঠাট্টা করতেই পারি। কিন্তু সেন্সরের এই ‘বিপ’থগামিতা আমাদের গণতন্ত্রের আকাশে যে বিপজ্জনক সিঁদুরে মেঘের পূর্বাভাস আনে, তার সম্পর্কে অবহিত হওয়া অতি আবশ্যক। রাষ্ট্রের হাতে হুকুম, নিয়ন্ত্রণ, বাধানিষেধ, দমনপীড়নের জাল যত শক্ত হবে, ততই সংকীর্ণ হবে গণতন্ত্রের বৃহত্তর পরিসর, যা নির্বাচনী ক্রিয়াকর্মের বাইরে বিরাজমান। আর যত হাসি তত কান্না, বলেই তো গেছেন রাম, থুড়ি, বিপ শর্মা।

লন্ডন স্কুল অব ইকনমিক্স-এ অর্থনীতির শিক্ষক